প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবর্তন ও মানবজাতির বিস্তারের যুগে পরিবেশ

১.১ পরিবেশ

বাস্তুতন্ত্রবিদ্যা বিজ্ঞানের সেই শাখা যা পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের অধ্যয়ন করে। 'পরিবেশ' বলতে বোঝায় সমগ্র জীবজগৎ (মানুষকে বাদ দিয়ে) এবং প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল, যাকে আমরা বলি Nature বা প্রকৃতি। বহু বহু যুগ আগে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর জুড়ে যখন প্রাচীন মানবজাতির অন্তর্গত আমাদের পূর্বপুরুষেরা আফ্রিকায় উদ্ভূত হয়ে ক্রমশ ইউরেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই সময় কুমারী প্রকৃতি (Virgin nature) (যে প্রকৃতি মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত নয়) ছিল সর্বোচ্চ। এছাড়াও আমাদের নিজস্ব প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স (*Homo sapiens sapiens*) দৈহিক গঠনানুযায়ী আধুনিক মানুষ (Anatomically Modern Man) আফ্রিকায় উদ্ভূত হয়ে গত ১৫০,০০০ বছরের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পরও এই অবস্থাই চলতে থাকে। কিন্তু নিওলিথিক বিপ্লবের পর মানুষ যখন কৃষিকার্য ও পশুপালন শুরু করে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখুন), নিজেদের অজান্তেই যে প্রাকৃতিক পরিবেশে তারা বাস করে, পর্যায়ক্রমে সেই পরিবেশের নানা অংশকে বদলে দিতে থাকে। তারপর আধুনিক যুগে, শিল্পের বিকাশ, জীবাশ্ম জ্বালানি ও নানারকম মারণাস্ত্রের (বারুদ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র) ব্যবহারের সাথে সাথে মানুষ দৃশ্যতই প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বা হেতু হয়ে ওঠে। এভাবে মানুষ অরণ্য ও বন্যপ্রাণী ধ্বংস করে, বায়ু ও জলদূষণ বৃদ্ধি করে, নিজের স্বার্থে নিজেই প্রকৃতির ক্ষতিসাধন করেছে।

১.২ প্লিস্টোসিন যুগে প্রাকৃতিক পরিবর্তন

এই উপ-পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করব ভূতাত্ত্বিক সময়কাল প্লিস্টোসিনে, যে সময়কাল প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর বিস্তৃত : প্রায় ১.৯ বা ১.৮ মিলিয়ন বছর আগে থেকে (যখন ওল্‌দুভাই ঘটনাটি অর্থাৎ যখন স্বাভাবিক চৌম্বক মেরুত্বে পরিবর্তন ঘটে) প্রায় ১০,০০০ বছর আগে অবধি (যখন দুটি তুষার যুগের মধ্যবর্তী কালে (interglacial) হলোসিন যুগ শুরু হল) ভৌত (physical) অবস্থায় কতটা পরিবর্তন হয়েছিল। প্লিস্টোসিন যুগের শুরুতে মানবগোষ্ঠীর আদি নিদর্শন হোমো হ্যাবিলিস (*Homo habilis*) এবং হোমো ইরেক্টাস (*Homo erectus*)-এর উদ্ভব হয় আফ্রিকায় এবং ওই মহাদেশ থেকে বেরিয়ে ইউরেশিয়ার বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপন করে। প্লিস্টোসিন যুগ যখন শেষ হয় তার মধ্যেই আমাদের এই আধুনিক মানব প্রজাতি আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ার সমস্ত মানব

Scanned with CamScanner

প্রজাতি বা উপপ্রজাতির স্থান দখল করে নেয় এবং কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন না হয়েই তারা অস্ট্রেলিয়া ও নতুন বিশ্বে (New world) নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে।

প্লিস্টোসিনের শুরুতে, যখন মহীসঞ্চরণের (continental drift) ফলে ভূপৃষ্ঠের প্রভূত পরিবর্তন ঘটে (যার ফলে ভারতবর্ষ সুবিশাল মহাদেশ গন্ডোয়ানাল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এই গন্ডোয়ানাল্যান্ডেরই অংশ ছিল বর্তমানের অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আন্টার্কটিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা) ; সেই সুদীর্ঘ কাল শেষ হয় এবং ভূগাঠনিক চাপের (tectonic stress) ফলে বিরাট বিরাট প্রাকৃতিক উত্থান ঘটে, যার অন্যতম হল হিমালয়ের সৃষ্টি। মোটামুটিভাবে বর্তমান সময়ের মানচিত্র থেকে অনুমেয় যে কুড়ি লক্ষ বছর আগে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের চেহারা কীরকম ছিল। ভূমির উত্থান (uplift), ক্ষয়, প্রস্তরখণ্ডের সঞ্চয়, হিমালয় ও শিবালিকের মতো উচ্চ পর্বত থেকে বাহিত বালুকণা ও পলি সঞ্চয় ইত্যাদি প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। এমনও বলা হয়ে থাকে যে আসলে গত ১৪ মিলিয়ন বছরে হিমালয়ের উত্থানের পরিবর্তে অবনমন (subsidence) ঘটেছে। নদীর গতিপথ ও উপকূল রেখারও পরিবর্তন ঘটেছে।

এইসব পরিবর্তন যে শুধুমাত্র ক্রমাগত চলতে থাকা ভূগাঠনিক চাপের জন্য হচ্ছিল তা নয়, তার সঙ্গে ছিল বিরাট জলবায়ুগত পরিবর্তন। বারংবার জলবায়ুর এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ হিসাবে ধরা হয় সূর্যের সাথে পৃথিবীর সম্পর্ককে। পৃথিবী সূর্যরশ্মি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে (insolation)। এই শক্তিসংগ্রহ বা ইনসোলশেনের পরিমাণে তারতম্য ঘটে, এর কারণ শুধুমাত্র পৃথিবীর আহ্নিক গতি নয় যার জন্য দিন-রাত্রি সৃষ্টি হয় ; এর পেছনে অন্য কারণও আছে—পৃথিবী সূর্যের চারপাশে বার্ষিক পরিক্রমণের সময় তার কক্ষপথে সব সময় সূর্যের সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রাখে না এবং পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষ লম্বভাবে না থেকে সামান্য হেলে থাকে (২৩°২৭′ কোণে)। আর এই নতির (tilt) জন্যই ঋতু সৃষ্টি হয়। একটি মানব প্রজন্মের ক্ষেত্রে হয়তো একটা স্থায়ী সময়কাল দেখা যেতে পারে যখন দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, যদিও ঋতুচক্র নিয়মিত ঘটে চলে। কিন্তু দীর্ঘ সময়কালের ক্ষেত্রে এরকম নাও হতে পারে, যদি—(ক) সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তন ঘটে ; (খ) পৃথিবী কক্ষতলের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষের 'বক্রতা' বা নতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে ; (গ) পৃথিবী নিজ আকৃতি নিয়ে যখন ঘূর্ণায়মান পথে সূর্যকে আবর্তন করতে থাকে তখন সূর্যের আলোকরশ্মির প্রতিফলন পৃথিবীপৃষ্ঠে সর্বত্র সমপরিমাণ থাকে না।

বর্তমানে পরিক্রমণরত অবস্থায় পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৪৭.১ মিলিয়ন থেকে ১৫২.১ মিলিয়ন কিমি অর্থাৎ গড় দূরত্ব ১৪৯.৬ মিলিয়ন কিমি। যদি কক্ষপথ বৃত্তাকার হত, সর্বাধিক দূরত্ব হত ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ ; সেক্ষেত্রে পৃথিবী সূর্যের থেকে অনেক কম পরিমাণ তাপ গ্রহণ করত। বর্তমানে এটা মনে করা হয় যে, এক লক্ষ বছরের প্রতি চক্রে

মোটামুটিভাবে এরকমই ঘটে আসছে যখন ওই চক্রের একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে পৃথিবী অপেক্ষাকৃত একটি দীর্ঘ শীতল (তুষারময়) পর্যায় অতিক্রম করে। একে বলা হয় **তুষার যুগ** (Ice Age)। পৃথিবীর মেরুঅক্ষের ক্ষেত্রে ৪১,০০০ বছরের এক একটি চক্র অতিক্রান্ত হয়। যৎসামান্য হলেও এই নতি বৃদ্ধি পেলে গ্রীষ্মকাল দীর্ঘ হয় এবং শীতকাল হ্রাস পায়, ফলে দেখা যায় উষ্ণতর গ্রীষ্ম ও শীতলতর শীতকাল। নতি হ্রাস পেলে ঠিক বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীত উভয়ই কম হয়, কিন্তু গ্রীষ্মে তুষার আস্তরণ বেশি না গললে তা সম্প্রসারিত হতে পারে। পরিশেষে, ২৩,০০০ বছরের এক চক্রে মহাবিষুব ও জলবিষুবের সময়ের অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটে, ফলে প্রত্যেক হিমযুগে বা তুষারযুগে এবং আন্তর্হিমযুগে (উষ্ণ পর্যায়) জলবায়ুর তারতম্য ঘটে, এর সঙ্গে অক্ষ ও নতির পরিবর্তন এবং বিষুব-এর পরিবর্তন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলে।

প্লিস্টোসিন যুগের দুই মিলিয়ন বছরে বেশ কয়েকটি তুষারযুগ এসেছে, অর্থাৎ যখনই সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব বেড়ে গেছে। এরকম সময়ে পৃথিবী যত শীতল হয়, ততই মেরু অঞ্চলে জমে থাকা বরফের স্তূপ (thermafrost) আরও ঘনীভূত ও প্রসারিত হয়। তুষারাবৃত উচ্চ পর্বতশ্রেণিতেও (যেমন হিমালয়) এরকম প্রসারণ ঘটে, ফলে হিমবাহগুলো উপত্যকায় নেমে যায়। প্রাচীনতর মোরেইনগুলিতে (হিমবাহগুলি দ্বারা পাদদেশে সঞ্চিত প্রস্তর ও মৃত্তিকা) বর্তমান স্তরের তুলনায় হিমালয়ে হিমবাহগুলোর প্রাচীনতর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং বর্তমানে হিমবাহগুলো যেখানে শেষ হয়ে নদী রূপে নেমে এসেছে সেই সব জায়গার (the 'snout') অনেক নীচে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের চিহ্ন পাওয়া যায়।

যেহেতু প্রতিটা তুষারযুগে প্রতিবছরই জল বেশি বেশি পরিমাণে বরফের স্তূপে পরিণত হয়, স্বাভাবিকভাবে নদী কম পরিমাণ জল সমুদ্রে বয়ে আনে। ফলে বাষ্পীভবনের ফলে সমুদ্রের জল যে পরিমাণে হ্রাস পায় তা পূরণ হয় না। তার ফলে সমুদ্রতল (sea level) হ্রাস পায়। সম্ভবত বিগত ৪০০,০০০ বছরে সমুদ্রতল অন্ততপক্ষে চারবার ১০০ মিটার নেমে গিয়েছিল (*চিত্র ১.১* দেখুন)। (একথা মনে রাখা দরকার যে সব মহাসাগর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সারা বিশ্বে সব সময় সমুদ্রতল সমান হয়)। এই সময়সীমার মধ্যে অনিয়মিত সময়কালের ব্যবধানে এগারো বার সমুদ্রতল বর্তমান তলের চাইতে ৭৫ মিটার নেমে গিয়েছিল। এরকম অবস্থা ১২০,০০০ বছরেরও বেশি সময় জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল, অর্থাৎ সমগ্র সময়কালের প্রায় ৩০ শতাংশ। অপর দিকে সমুদ্র তার বর্তমান তল বজায় রাখতে পেরেছে সম্ভবত মাত্র তিনবার, হিসাব অনুযায়ী বিগত ৪০০,০০০ বছরের মধ্যে মাত্র ৫,৬০০ বছর অর্থাৎ সমগ্র সময়কালের মাত্র ১.৫ শতাংশ। আমাদের *মানচিত্র ১.১*-এ দেখানো হয়েছে তুষারযুগে সমুদ্রতল বর্তমান স্তর থেকে ৭৫ মিটার নেমে ভারতের উপকূল রেখা কেমন ছিল।

Scanned with CamScanner

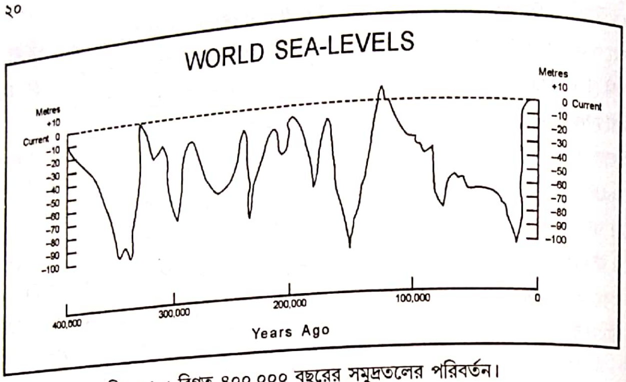

চিত্র ১.১ : বিগত ৪০০,০০০ বছরের সমুদ্রতলের পরিবর্তন।

সূত্র : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক (*National Geographic*) ফয়েজ হাবিব কর্তৃক পুনঃঅঙ্কিত।

ভূমিরূপের প্রসঙ্গে আসা যাক, প্লিস্টোসিন যুগের গোড়ার দিকে প্রাকৃতিক অবস্থা বর্তমানের অনুরূপই ছিল, তার সহজ কারণ হচ্ছে প্লিস্টোসিন যুগের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দুই মিলিয়ন বছরের সময়কাল, ভূপৃষ্ঠের গড়ে ওঠা ও পরিবর্তন ঘটার যে

মানচিত্র ১.১ ভারতবর্ষ : তুষারযুগীয় উপকূলরেখা, বর্তমান সমুদ্রতল থেকে ৭৫ মিটার নীচে

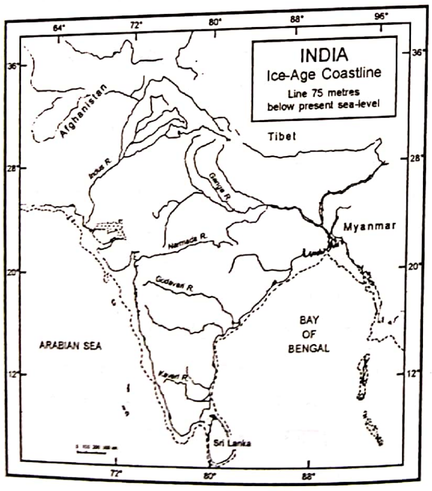

সমগ্র সময়কাল অর্থাৎ ৪,৬০০ মিলিয়ন বছরের একটি ক্ষুদ্র অংশ (প্রায় ০.০৪ শতাংশ)। আবার এমনও হতে পরে, পৃথিবী যত ঠান্ডা হয়েছে, ভৌত পদার্থসমূহ ক্রমশ স্থিত হয়ে দৃঢ় হয়েছে ; এছাড়া মহীসঞ্চরণ আংশিক সাম্যাবস্থায় পৌঁছনোর পর এর বেগ অনেকটা কমে যায়। যদিও ভূগাঠনিক চাপ অনেকটা প্রশমিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভূভাগের উত্থান (uplift) ও অবনমন (subsidence) যা এখনও হয়ে চলেছে তার অন্যতম কারণ

মানচিত্র ১.২ ভারতীয় পাতের চারিধারে ভূগাঠনিক চাপ

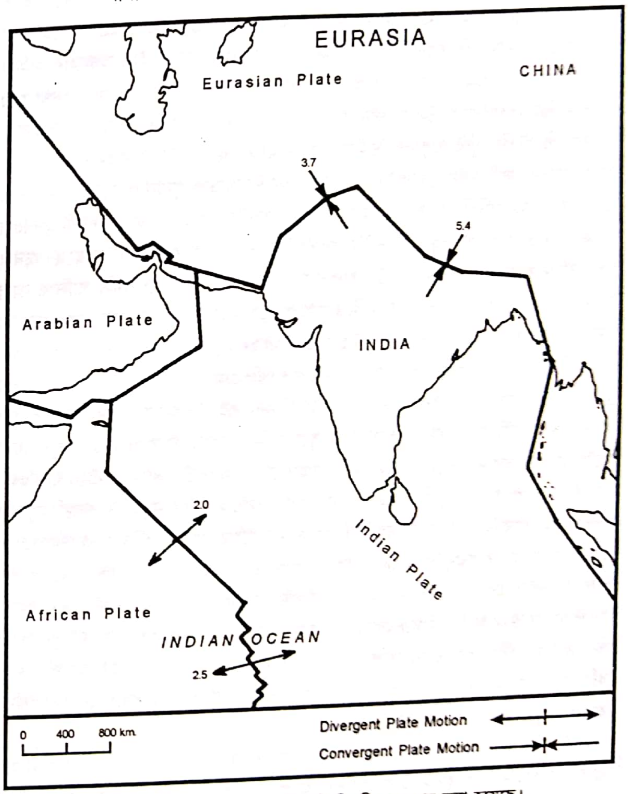

টীকা : বার্ষিক গতি (সেমি) বোঝানোর জন্য দ্বি-মুখী তিরচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

হিসাবে এই চাপ রয়েই গেছে। (ভারতবর্ষ ও সংলগ্ন অঞ্চলে ভূগাঠনিক প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থা বোঝার জন্য *মানচিত্র ১.২* দেখুন)।

পার্বত্য অঞ্চলে প্রাকৃতিক ভূমিরূপ পরিবর্তনে ভূগাঠনিক চাপের সঙ্গে যুক্ত বরফের পিণ্ড হিমবাহ রূপে পর্বতে জমা হয় এবং নিজভারে এক সময় ভেঙে নীচে নেমে আসে। এসময় বড়ো প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদি যা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকেও নীচে নিয়ে আসে। ভূগাঠনিক উত্থানের (uplift) সময় কোনো মালভূমির মধ্যে দিয়ে পথ কেটে হিমবাহটি অগ্রসর হয়, তাহলে মালভূমিটি পরিণত হতে পারে পর্বতশ্রেণিতে। আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি তুষারযুগে হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত অঞ্চল ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে এবং বড়ো বড়ো প্রস্তরখণ্ড ও তুষারপিণ্ডবাহী হিমবাহগুলো নেমে এসে পার্বত্য অঞ্চলের বাইরে চলে এসেছে। পশ্চিম হিমালয় থেকে নেমে আসা বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড দেখা যায় উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের (বর্তমানে পাকিস্তান) ইসলামাবাদের দক্ষিণে পটওয়ার মালভূমিতে।

তাই প্লিস্টোসিন যুগে প্রাকৃতিক ভূমিরূপের (landscape) কতটা পরিবর্তন ঘটতে পারে, তা কাশ্মীরের একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। চিনা পরিব্রাজক জুয়ান ঝুয়াং (হিউয়েন সাঙ ৬৪০ খ্রি.)-এর লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, কাশ্মীর উপত্যকা আগে একটি হ্রদ ছিল (*উদ্ধৃতি ১.১ ক* ও *খ* দেখুন) ; প্রাচীন হ্রদের উঁচু তলের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ প্লিস্টোসিন যুগে অনেকদিন ধরে উপত্যকার মধ্যে বা হ্রদের তলদেশে পলি, বালি ও কাদা জমে 'কারেওয়া' ও 'টেবিল ল্যান্ড' সৃষ্টি হয়েছিল। তুষারযুগে পর্বতের তুষার স্তর এবং তা থেকে নেমে আসা হিমবাহের দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল এই হ্রদ। ভূগাঠনিক চাপজনিত উপত্যকার ভূমির উত্থান হওয়ায় বা হ্রদের তলদেশে ক্রমাগত পলি জমা হওয়ায় অথবা উভয় কারণেই হ্রদের তল বারামুলা ফাঁকের ওপরে উঠে আসে এবং এই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে হ্রদের জল ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। প্লিস্টোসিন যুগের ঠিক কোন্ সময় এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল, তা বলা না গেলেও, অনুমান করা হয় যে তা পরবর্তী কোনো পর্যায়ে ঘটেছিল।

উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলে (সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি), তুষারযুগ ও আন্তর্হিমযুগের পালাক্রমে আবর্তন, নদীর জলের পরিমাণ ও নদীবাহিত পলির পরিমাণকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। তুষারযুগে নদীমুখে যখন (প্রধানত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু) অনেক কম পরিমাণ পলি জমা হয়, তখন আমরা দেখেছি যে সমুদ্র কিছুটা পশ্চাদপসরণ করে। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ পর্যায়ে সমুদ্র জলতলের মাত্রা বেড়ে গেলে সমুদ্র হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে চায়, নদীগুলিও তখন বেশি পরিমাণ জল নদীমুখে বহন করে নিয়ে আসে ; ফলে বদ্বীপের কাছে সমুদ্র অগভীর হয় এবং আরও বেশি পরিমাণ ভূমি সমুদ্রগর্ভে চলে যায়। অর্থাৎ সমুদ্র অনেকটা এগিয়ে আসে।

এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে হিমালয় অঞ্চলে ভূগাঠনিক উত্থান সব জায়গায় সমানভাবে হয়নি এবং বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উত্থিত হয়েছে। এই অসমরূপতার জন্যই পার্বত্য অঞ্চলে নদীর গতিপথ অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে ; উঁচু

নীচু জায়গার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হবার সময় একটি গতিপথ অবরুদ্ধ হয়েছে, তো অন্য গতিপথ সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে নানারকম সম্ভাবনা কল্পনা করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে হিমালয়ের উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাত রয়েছে। উত্তরেরটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের (তিব্বতে ইয়ালুতসাংপো [Yalutsangpo] নামে প্রবাহিত) বিশাল উপত্যকা, মান সরোবর হ্রদসমূহ, শতদ্রুর সর্বোচ্চ অংশ এবং সিন্ধুর বিশাল উপত্যকা নিয়ে এই খাতটি গঠিত ; উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কারাকোরাম থেকে এই খাত হিমালয়কে পৃথক করেছে। মনে করা হয় এই সুদীর্ঘ খাতটি অধুনা অবলুপ্ত কোনো সুবিশাল নদী (The 'Tibet River') দ্বারা সৃষ্ট। এর সমান্তরাল দক্ষিণ খাতটি সেই ফাঁকটি দ্বারা গঠিত যা এখন দেখা যায় হিমালয়ের দক্ষিণ ঢাল ও শিবালিক পর্বতশ্রেণির মধ্যে। এই খাতটি মোটামুটি কয়েকটি বিযুক্তি ব্যতিরেকে অসম থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ফাঁকটিও যদি একটি নদীর দ্বারা সৃষ্ট ('শিবালিক নদী') হয়ে থাকে, তাহলে এই অনুমানের দ্বারা শিবালিক অঞ্চলে বিস্তৃত বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই ও অমসৃণ নুড়ির অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করা যায়। এই দুই বৃহৎ খাতের ব্যাখ্যা অবশ্যই অনুমানভিত্তিক। অনেকেই তা সমর্থন করেন না, কিন্তু এই অনুমান ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যাই এই সমান্তরাল খাতদ্বয়ের অবস্থানের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয় না।

নরম পলিজাত সিন্ধু-গাঙ্গেয় অববাহিকায় নদীর গতিপথ পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত কম অনুমানভিত্তিক। সমতলভূমির গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীব্যবস্থায় গাঙ্গেয় ডলফিন (*Platanista gangetica*) ব্যাপকভাবেই দেখা যায় ; ওই একই প্রজাতির কিন্তু একটু ছোটো আকারের ডলফিন (*P. g. minor*) দেখা যায় সিন্ধু নদীব্যবস্থায়। এই প্রাণী স্থলে চলাফেরা করতে পারে না, সুতরাং এই দুই নদীব্যবস্থায় একই প্রজাতির অস্তিত্ব সম্ভব যদি কিছুকালের জন্য হলেও যমুনা সিন্ধুর উপনদী হয়ে থাকে, তবেই গাঙ্গেয় ডলফিনের পক্ষে সিন্ধুতে পৌঁছোনো সম্ভব। অথবা সিন্ধুতে যদি ডলফিন প্রথম এসে থাকে তাহলেও তার গঙ্গায় পৌঁছোনো সম্ভব যদি যমুনা সিন্ধু নদীব্যবস্থার অন্তর্গত হয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালে গঙ্গায় মিশে গিয়ে থাকে। যমুনার কাছাকাছি শুরু হয়ে চৌতাঙ্গ (Chautang) নদী, শুষ্ক ঘগ্গর-হাক্‌রার গতিপথ অনুসরণ করে বাহাওয়ালপুর জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, এটা যমুনার প্লিস্টোসিন যুগের গতিপথ হয়ে থাকতে পারে। ডলফিনের দুটি দলের মধ্যে আকারের পার্থক্য থেকে বোঝা যায় যমুনা-সিন্ধুর মধ্যকার সংযোগ অনেকদিন আগেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং তা প্লিস্টোসিন যুগের মধ্যেই। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই ডলফিন একই প্রজাতিভুক্ত।

১.৩ প্লিস্টোসিন যুগে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ

জলবায়ুর পরিবর্তন অনিবার্যভাবে **উদ্ভিদজগৎ**কেও প্রভাবিত করে। তুষারযুগে বৃষ্টিপাত অপর্যাপ্ত হয় এবং নদীর জলের পরিমাণ কম থাকে, ফলে শুষ্কতার পরিমাণ বাড়তে

Scanned with CamScanner

থাকে। ফলে অরণ্যের পরিবর্তে উষর প্রান্তর আর মরুভূমি বাড়তে থাকে। রাজস্থানের কয়েকটি অঞ্চল এবং উত্তর গুজরাতের জীবাশ্মীভূত বালিয়াড়ি তার প্রমাণ। যে আবহবিকার ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এরা অতিক্রম করেছে, সেটাই এদের প্রাচীনত্বকে চিহ্নিত করছে। দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশে জ্বালাপুরমে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে তুষারযুগের শুষ্কতার উদ্ভিদজনিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেছে যে শেষ তুষারযুগ তার শীতলতম উচ্চতায় পৌঁছেছিল প্রায় ২০,০০০ বছর আগে এবং সমুদ্রতল বর্তমান স্তর থেকে ১১০ মিটার নেমে গিয়েছিল। এরপরই একটি উষ্ণ পর্যায় শুরু হয়, প্রায় ১০,০০০ বছর আগে সমুদ্রতল বর্তমান স্তর থেকে মাত্র ২০ মিটার নীচে ছিল। এই পরিবর্তন জ্বালাপুরমে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। খননকারীগণ ওখানে খনন করে "ডি" স্তরে [Stratum D ৩৪,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর আগের প্রাধান্যকারী তৃণভূমি (প্রায় ৭৫ শতাংশ)] প্রমাণ পেয়েছেন ; কিন্তু "সি" স্তরে ১৫,০০০ থেকে ১১,০০০ বছর আগের সময়কালে তৃণভূমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৪৫ শতাংশে নেমে যায়। সেক্ষেত্রে বনভূমি প্রাচীনতর "ডি" স্তরে ২৫ শতাংশ থেকে বিস্তৃত হয়ে "সি" স্তরে ৫৫ শতাংশে পৌঁছোয়। অন্যভাবে বললে, তুষারযুগের সর্বোচ্চ অবস্থা অতিক্রম করে পৃথিবী উষ্ণ হতে শুরু করলে শুষ্কতার মাত্রা হ্রাস পায় এবং স্তেপ ও তৃণভূমির জায়গায় বনভূমি ও জঙ্গল বিস্তার লাভ করতে থাকে।

প্লিস্টোসিনের শুরুতেই উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় জগতেরই বর্তমান প্রধান প্রধান প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছিল। যেহেতু মানুষের অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র বায়ুপ্রবাহ ও জলের সাহায্যে অথবা পশুপাখির বিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্ভিদ বিস্তার লাভ করতে পারে, এক একটি উদ্ভিদ প্রজাতি উদ্ভব হওয়ার মতো অঞ্চল সীমাবদ্ধ ছিল। এইরকম এক একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে কোনো একটি উদ্ভিদ প্রজাতি সম্ভবত সামান্য অভিযোজিত হয়ে মিউটেশন বা পরিব্যক্তির মাধ্যমে নতুনতর প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে পারত। সেইজন্য ধরে নেওয়া হয় যে বন্য ঘাসের প্রজাতি থেকে পরবর্তীকালের কর্ষণযোগ্য খাদ্যশস্য উদ্ভূত হয়েছিল। তা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলেই সীমিত ছিল। কেবলমাত্র মনুষ্য চালিত বিস্তার বা ব্যাপনের মাধ্যমেই কর্ষণযোগ্য প্রজাতি বৃহত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলের গাছ সমেত অন্যান্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। যখন মানুষ এদের গৃহে পালন বা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল তখনই এসকল প্রজাতির ব্যাপকভাবে ব্যাপন বা প্রসার লাভ সম্ভব হল। তাই সম্ভবত প্লিস্টোসিন যুগের উষ্ণ পর্যায়ে ইউরেশিয়ায় বর্তমানের তুলনায় আরও বেশি সংখ্যক উদ্ভিদ প্রজাতি ও উপপ্রজাতির (প্রত্যেকেরই বাসস্থান [Habitat] ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলে) অস্তিত্ব ছিল ; কিন্তু তার অন্তর্গত প্রত্যেকটি অঞ্চল সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে না। উদাহরণস্বরূপ ভারতে সম্ভবত ওই যুগে বর্তমান অপেক্ষা কম সংখ্যক উদ্ভিদ প্রজাতি ছিল ; কেননা মনুষ্য প্রচেষ্টায় বা অন্যভাবে যে প্রজাতিগুলি এখানে এসেছে

সেগুলি তখন অনুপস্থিত ছিল। অবশ্য এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে তুষারযুগের প্রত্যেকটি আগমনের সাথে সাথে উত্তর অক্ষাংশে এবং নিম্ন অক্ষাংশেরও কিছু কিছু অঞ্চলে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে ভারতসহ অন্যান্য দেশে প্লিস্টোসিন যুগ এবং হলোসিন যুগের প্রথম পর্যায়ের (যা ১০,০০০ আগে শুরু হয়েছে) মধ্যে উদ্ভিদ সম্পদের তুলনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

প্লিস্টোসিন যুগের শেষ দিকে অর্থাৎ ৮,০০,০০০ বছর আগে শীতল ও উষ্ণ পর্যায়ের পালাক্রমে আবর্তন ঘন ঘন ঘটতে থাকে। সেই সময় ছিল নিশ্চিতভাবেই বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর কাছে একটা পরীক্ষার সময় এবং সুযোগ। হিমকার্যের (glaciation) ফলে সমুদ্রতল নেমে যায়, বড়ো বড়ো অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ভঙ্গ হয়, ফলে স্থলচর প্রাণী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী স্থলসেতু ২০,০০০ বছর আগে শেষবারের মতো বন্ধ হওয়ার আগেই নিশ্চয় হাতি শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছিল ; আবার এই দ্বীপে বাঘের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে বাঘ দক্ষিণ ভারতে পৌঁছেছে অনেক পরে। সমুদ্রতল যতই নামুক না কেন অস্ট্রেলিয়া তখনও বিচ্ছিন্ন ছিল, তাই অস্ট্রেলিয়া মার্সুপিয়াল স্তন্যপায়ীদের (যারা শাবকদের উদরস্থিত থলিতে বহন করে, যেমন ক্যাঙ্গারু) বিবর্তনের সাক্ষী। মার্সুপিয়ালরা সেখানে বন্যপ্রাণীজগতে ততদিন পর্যন্ত আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল যতদিন অস্ট্রেলিয়ান বন্যকুকুর ডিঙ্গো (Dingo) কয়েক হাজার বছর আগে কোনো বহিরাগত মানব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সেখানে পৌঁছোয়। এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকায় যেখানে এইরকম বা তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রজাতি ইচ্ছামতো বিচরণ করত, সেখানে শেষপর্যন্ত অসংখ্য প্রধান স্তন্যপায়ী প্রজাতির উদ্ভব ও বিস্তারলাভ ঘটে, যাদের বর্তমানেও দেখতে পাওয়া যায়। তুষারযুগের সর্বোচ্চ সময়ে যখন আলাস্কা ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী বেরিং সাগরের কিছুটা অংশ শুকিয়ে যায় তখন শীতল জলবায়ুর কিছু স্তন্যপায়ী প্রজাতি উত্তর আমেরিকার মধ্যে অথবা বাইরে চলে গিয়েছিল, যদিও উষ্ণ অঞ্চলে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় স্বতন্ত্রভাবে স্থানীয় কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তন ঘটেছিল, যারা পুরোনো বিশ্বের প্রজাতিসমূহের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, যেমন—পেরুর লামা, এশিয়ার ক্ষুদ্রতর কুঁজবিহীন উটের সমগোত্রীয় (cousin) প্রজাতি।

ইউরেশিয়ায় সমস্ত প্রধান স্তন্যপায়ী প্রজাতি প্লিস্টোসিন যুগেই তাদের বর্তমান আকার ধারণ করেছিল, কারণ স্তন্যপায়ী প্রজাতিরা ১ থেকে ২ মিলিয়ন বছর পর্যন্ত নিজেদের অপরিবর্তিত রাখতে পারে এবং প্লিস্টোসিন যুগ শেষ হয়েছে মাত্র ১০,০০০ বছর আগে। একথাও সত্যি যে, বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন না ঘটাতে পেরে, অথবা খাদ্যের একই উৎসের অন্য আরও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে টিকতে না পেরে, কিংবা প্লিস্টোসিন যুগের একেবারে শেষের দিকে মানুষের হাতে নিধন হয়ে।

Scanned with CamScanner

প্লিস্টোসিন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর বিবর্তন, মৃত্যু ও টিকে থাকা কীভাবে ঘটেছে তা দুই ধরনের প্রজাতির কথা দিয়ে দেখানো যায়, যাদের গৃহে প্রতিপালন করার প্রক্রিয়া ভারতের প্রাণীজগতের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যথা—হাতি এবং গবাদি পশু।

হাতিদের (Probiscidae) মধ্যে বর্তমানে দুটি প্রজাতির অস্তিত্ব রয়েছে—আফ্রিকান এবং এশীয় বা ভারতীয়। প্লায়োসিন যুগে হাতির অনেক প্রজাতি ছিল। কাশ্মীরসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত প্লায়োসিন এবং প্লিস্টোসিন যুগের প্রথম পর্যায়ের জীবাশ্ম থেকে এরূপ ১৭টি প্রজাতি চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে অর্থাৎ যেখানে হাতির স্বাভাবিক বাসস্থান, সেখানে সুদীর্ঘ তুষারযুগের ফলে সৃষ্ট শুষ্কতার জন্য সম্ভবত হাতির অনেক প্রজাতি মৃত্যুর কবলে পড়েছিল। এদের মধ্যে কেবলমাত্র একটি প্রজাতি উলি ম্যামথ (Woolly mammoth) ইউরোপ, সাইবেরিয়া ও উত্তর আমেরিকার বরফশীতল পরিবেশে সফলভাবে অভিযোজন ঘটাতে পেরেছিল। এর উৎপত্তি প্রায় ৪০০,০০০ বছর আগে। ১৫,০০০ বছর আগে শেষ উষ্ণ পর্যায় যেই শুরু হল এবং ম্যামথদের বাসস্থানের প্রায় নয়-দশমাংশ বরফমুক্ত হল ও উষ্ণ হয়ে উঠল, প্রাণীটির সংখ্যা দ্রুতহারে হ্রাস ঘটল। সুস্বাদু মাংসের জন্য মানুষের হাতি শিকার সম্ভবত ১০,০০০ বছর আগে ম্যামথের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন করেছিল। ভারতীয় হাতি তার আফ্রিকান স্বজাতিদের মতোই তুষারযুগে শুষ্কতা সহ্য করে টিকেছিল। যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সম্ভবত এই সময়েই তারা সাময়িকভাবে সৃষ্ট স্থলসেতুর সাহায্যে শ্রীলঙ্কায় ও ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। হলোসিন যুগের সূত্রপাতের সময় থেকে অর্থাৎ দুটি হিমযুগের মধ্যবর্তী বর্তমান সময়ে ভারতে হাতির বাসস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত। এমনকি সিন্ধু অববাহিকার শুষ্কভূমিতে তারা বিচরণ করত ; পাকিস্তানের বোলান গিরিপথের নীচে স্তেপসদৃশ সমতলভূমিতে, মেহরগড়ে নিহত হাতির অস্থি পাওয়া গেছে, যার স্তর ৭,০০০ বা ৬,০০০ বছর আগের (মেহরগড়, পর্যায় ২—৫,০০০-৪,০০০ খ্রি.পূ.)।

অরোক (Auroch) বা বন্য ষাঁড় হাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এই অরোক থেকেও হাতির মতো অনেক প্রজাতি বিবর্তিত হয়েছিল। এইরকম একটি প্রজাতি হল বর্তমানের গৃহপালিত ষাঁড় বা বলদের পূর্বপুরুষ। 'জেবু' বা কুঁজযুক্ত ষাঁড় (*Bos indicus*)—যার সঙ্গে ভারতে আমরা খুবই পরিচিত, বর্তমানে গৃহপালিত গবাদি পশুর একটি অন্যতম উপ-প্রজাতি, জীবাশ্ম থেকে এই উপ-প্রজাতির প্রারম্ভিক ইতিহাস জানা খুবই কঠিন ; কিন্তু তুলনামূলক ডি. এন. এ. অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে ৬,০০০,০০০ থেকে ১ মিলিয়ন বছর আগে তাদের পূর্বপুরুষ কুঁজবিহীন টরাইন ষাঁড় (taurine ox—*Bos tauranus*) (ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় দেখা যায়) থেকে পৃথক

হয়েছিল। যদিও জেবু অনেক পরবর্তীকালে সুস্পষ্ট উপ-প্রজাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দুই ধরনের গবাদি পশুর দুটি পৃথক প্রজাতি রূপে বিবর্তিত হওয়ার পক্ষে এই সময়কাল যথেষ্ট নয় ; এবং জেবু কেবলমাত্র টরাইন-এর সঙ্গে সংকরায়ণে সমর্থ তাই নয়, ভারতের কুঁজবিহীন গয়াল (*Bos frontalis*) এবং পশমদার তিব্বতি ইয়াক (*Bos grunniens*)-এর সঙ্গেও আন্তঃপ্রজননে সক্ষম। বড়ো কুঁজ ছাড়াও জেবুর বিশেষত্ব হল যে উষ্ণ তাপমান ও শুষ্ক অবস্থাতেও এরা মানিয়ে নিতে পারে, যা গবাদি পশুর অন্যান্য উপ-প্রজাতি পারে না। তাই চরম অবস্থাতেও এরা তুষারযুগের শুষ্কতা এবং আন্তর্হিমযুগের উষ্ণতা সহ্য করতে পারে। হলোসিন যুগের (৮,০০০ খ্রি. পূ.) শুরুতে এদের আদি বিচরণভূমি সম্ভবত ভারতের শুষ্ক অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

জলজ মহিষ (*Bos bubalus*) প্লিস্টোসিন যুগের মধ্যে বা হয়তো তার অনেক আগেই স্বতন্ত্র প্রজাতিরূপে বিবর্তিত হয়েছিল ; এশিয়ার ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে, ভারত থেকে শুরু করে পূর্বে দক্ষিণ ও মধ্য চিন পর্যন্ত বন্য অবস্থায় এদের অস্তিত্ব ছিল। যদিও এদের বেশিরভাগই এখন গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়েছে, তবুও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে বন্য অবস্থায় এই প্রাণীর অস্তিত্ব রয়ে গেছে, মুঘল আমলে আরও বিস্তৃত অঞ্চলে এদের দেখা যেত বলে জানা যায়। জেবুর মতো মহিষও উষ্ণ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, কিন্তু জলের প্রতি আকর্ষণ এদের বেশি, তাই বন্য অবস্থায় এরা নদীনালা ও জলাভূমিতে বাস করত। পরবর্তী প্লিস্টোসিন যুগে, ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, সিন্ধু সমভূমির পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এদের বাসস্থান ছিল।

গৃহপালিত পশু রূপে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কের জন্যই হাতি ও গবাদি পশু এই দুই প্রজাতি সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ বেশি (যদিও গবাদি পশুর চেয়ে হাতি অনেক বেশি সংখ্যায় এখনও বন্য অবস্থায় রয়ে গেছে)। তবু আমাদের মনে রাখতে হবে, যে প্লিস্টোসিন যুগের শেষ পর্যায় পর্যন্ত পশুদের গৃহে প্রতিপালনের খুবই কম লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, তখনও পর্যন্ত মনুষ্য প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তারা বন্য অবস্থাতেই ছিল, ব্যতিক্রম হচ্ছে মানুষ অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের মতোই এদেরও মাংস খাদ্যরূপে পাবার জন্য শিকার বা হত্যা করত। প্লিস্টোসিন যুগে যে সকল স্তন্যপায়ী প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছিল, তাতে মানুষের ভূমিকা বিশেষ ছিল না বা থাকলেও তা অতি সামান্য। যেমন অন্ধ্রের কুরনুল গুহায় প্রাপ্ত প্লিস্টোসিন যুগের বিভিন্ন প্রজাতির জীবাশ্ম থেকে বোঝা যায়, তারা আর্দ্র জলবায়ুতে অভ্যস্ত ছিল এবং সম্ভবত তুষারযুগের শুষ্কতাই তাদের মৃত্যুর কারণ ; বিপরীতক্রমে যারা তৃণভূমিতে থাকত তারা আন্তর্হিমযুগীয় (interglacial) পর্যায়ের উষ্ণ-আর্দ্র অবস্থায় টিকে থাকতে পারেনি। ভারত থেকে জলহস্তী, বন্য ঘোড়া ও স্পটেড হায়না বিলুপ্ত হবার পিছনে অন্তত পক্ষে আংশিক কারণ হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন ; প্রথম এবং তৃতীয়টি এখন কেবলমাত্র আফ্রিকায় টিকে আছে। অস্ট্রিচ এখন কেবলমাত্র আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ, এই অস্ট্রিচের ডিমের খোলস পাওয়া

Scanned with CamScanner

গেছে শ্রীলঙ্কার বাটাদোম্বালেনা-য় (২৮,৫০০ বছরের পুরোনো) এবং মহারাষ্ট্রের পাটনে-তে (২৪,০০০ বছরের পুরোনো)। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো এই পাখির ভারত থেকে বিলুপ্ত হওয়ায় জন্য শিকারি মানুষই প্রধানত দায়ী।

১.৪ মনুষ্য প্রজাতির বিবর্তন ও বিস্তার

'People's History of India' সিরিজের প্রথম মোনোগ্রাফ 'Prehistory' বা 'প্রাক-ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রাইমেট বর্গের মানবগোষ্ঠীর বিবর্তন এবং প্রথম মানব প্রজাতির আদি বাসস্থান থেকে ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বানরের মতো দ্বি-পদ বিশিষ্ট জীব অস্ট্রোলোপিথেসিন্‌স (*Austrolopithecines*) প্রায় চার কোটি বছর আগে উদ্ভূত হয় এবং মনুষ্য প্রজাতির পূর্বপুরুষ 'হোমিনিড' (Hominid)-এর আবির্ভাব ঘটে। যেহেতু তাদের অবশিষ্ট প্রাণীদের আফ্রিকায় পাওয়া গেছে, তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে, তাদের মানব উত্তরাধিকারীও আফ্রিকাতেও প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক স্থানে প্রথম দুই মনুষ্য প্রজাতি হোমো হ্যাবিলিস (*Homo habilis*) ও হোমো ইরেক্টাস (*Homo erectus*) এবং তাদের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্র (artefacts) আবিষ্কার হওয়ায় এই ধারণা আরও জোরালো হয়েছে ; এই অস্ত্রগুলি প্লিস্টোসিন যুগেরও আগের ১.৮ মিলিয়ন বছরের পুরোনো (*মানচিত্র* ১.৩ দেখুন, এই স্থানগুলি বেশিরভাগই গ্রেট রিফ্‌ট উপত্যকা (Great Rift Valley)-র মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেখানে আফ্রিকান পাতের মধ্যে ক্রমাগত ভূগাঠনিক উত্থান (uplift) হয়ে চলেছে এবং তার সাথে সাথে অগ্ন্যুৎপাত। এই ফাটল লোহিত সাগরের দক্ষিণ প্রান্ত (যা টেকনিকাল দিক থেকে এরই অংশ) থেকে ইথিওপিয়া, কেনিয়া, তানজানিয়া, মালওয়াই হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহৎ মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। মনে করা হয় যে এই গ্রস্ত উপত্যকা, তার পার্বত্য ভগ্নপার্শ্বসমূহ ও সারি সারি সাভানা (বেশিরভাগ বৃক্ষহীন প্রান্তর)-এর মাঝখানে অসংখ্য প্রাকৃতিক জলাধারের অবস্থান মানুষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করেছে, যে মানুষ তখনও পর্যন্ত আগুনের ব্যবহার জানত না এবং ভাঙা পাথরের টুকরো (oldowan tools) ছাড়া তাদের আর কোনো অস্ত্র ছিল না। অতিকায় আক্রমণকারী জন্তুদের সামনে অসহায় মানুষ একমাত্র নিজেদের রক্ষা করতে পারত দলবদ্ধভাবে পাহাড় ও গুহায় আশ্রয় নিয়ে। সেখানে পাহাড় থেকে তারা আংশিক শিকারি ও আংশিক খাদ্যসংগ্রাহক প্রাণী রূপে দূরের বৃক্ষহীন প্রান্তরে আক্রমণকারী প্রাণীদের ও শিকার দেখতে পেত। সাভানার ঝোপঝাড়, তৃণভূমির ভোজ্য ফল, শিকড়, বীজ তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করত। তাই আফ্রিকার এই গ্রস্ত উপত্যকা (Rift valley) যা প্রাচীন পৃথিবীর অনন্য ভৌগোলিক নিদর্শন, মানব প্রজাতিকে তার শৈশবাবস্থায় সবচেয়ে বড়ো নার্সারি প্রদান করেছিল। এক্ষেত্রে আমাদের পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

মানচিত্র ১.৩ আফ্রিকা : গ্রেট রিফ্‌ট উপত্যকায় মানুষের আবির্ভাব
(হোমো হ্যাবিলিস ও হোমো ইরেক্টাস কেন্দ্রসমূহ)

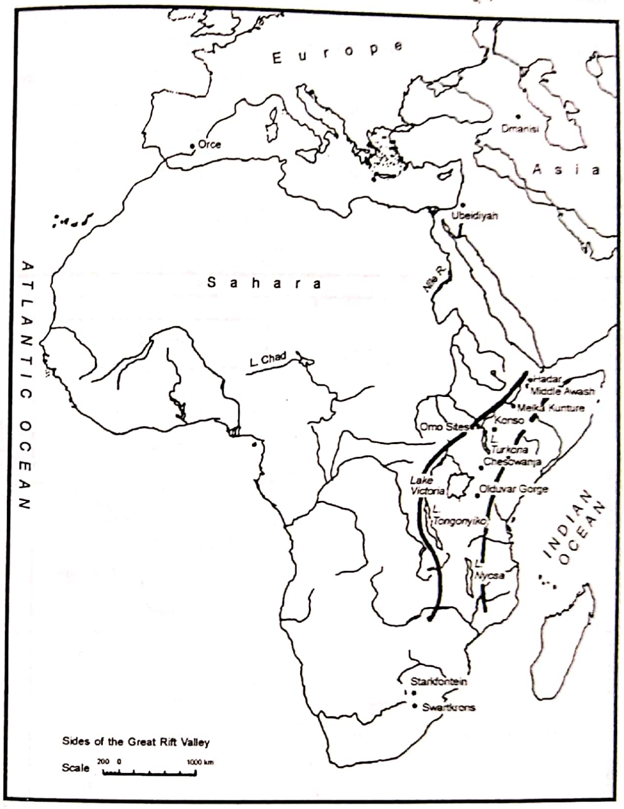

সম্ভবত কোনো না কোনো শীতল পর্যায়ে সমুদ্রতলের উচ্চতা হ্রাস পাওয়ার সুযোগে হোমো হ্যাবিলিস ও হোমো ইরেক্টাস আফ্রিকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্ভবত অনুরূপ পরিবেশ (গ্রস্ত উপত্যকা) সন্ধান করে বসবাস করতে থাকে, সেসব স্থানে তাদের অবশেষ পাওয়া গেছে ; যেমন জর্ডন উপত্যকায় উবেদিয়া (১.৪ মিলিয়ন বছর আগে),

Scanned with CamScanner

যা আফ্রিকার গ্রস্ত উপত্যকারই ধারাবাহিক অংশ ; ককেশাস পর্বতমালার দ্মানিসি (Dmanisi—১.৭ মিলিয়ন বছর আগে) এবং চিনের ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়ি অঞ্চল রেঞ্জিদং (২.২৫ মিলিয়ন বছর আগে) ও লঙ্গগুপো (Longgupo-১.৯ মিলিয়ন বছর আগে)। পাকিস্তানে ইসলামাবাদের দক্ষিণে রিওয়াত, যেখানে ২ মিলিয়ন বছরেরও প্রাচীন ওল্ডোয়ান (Oldowan) অস্ত্রাদি পাওয়া গেছে, সেখানেও অনুরূপ পরিবেশের সন্ধান মেলে, একই পরিবেশ সৃষ্টি করেছে পটওয়ার অধিত্যকা, এর দক্ষিণে সল্টরেঞ্জ (মানচিত্র ১.৪)। এর পূর্বে যেখানে ঝিলম নদী গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, এর ডানপাশের সীমানা সল্টরেঞ্জ এবং বাঁপাশের সীমানা

মানচিত্র ১.৪ ভারতবর্ষ : প্রস্তরযুগীয় কেন্দ্রসমূহ, প্রাচীন ও মধ্যপ্রস্তর যুগ
(প্রস্তরযুগীয় কেন্দ্র সংক্রান্ত পাঠের মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে)

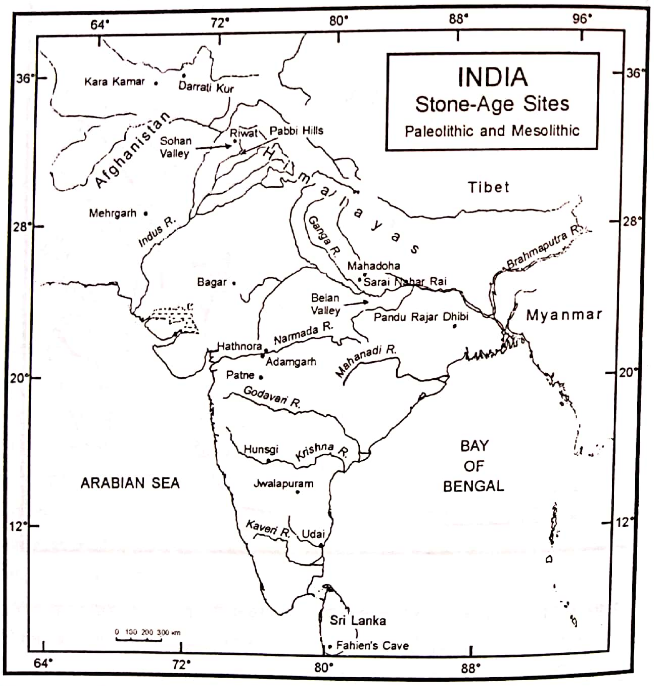

টীকা : সোহান উপত্যকা = পটওয়ার মালভূমি। মেহরগড় ও পান্ডু রাজার ঢিবি হল নব্যপ্রস্তর অঞ্চল।

পাব্বি পর্বত, এখানে নুড়ি-ফলকের চিলকা অস্ত্র পাওয়া গেছে পাব্বি পর্বতে যার সময় ১.৬ থেকে ১.৯ মিলিয়ন বছর। আরও পূর্বে সীমান্তের ভারতীয় দিকে জম্মু শিবালিকে একই ধরনের পাথরের অস্ত্র পাওয়া গেছে যা সম্ভবত আরও পূর্বকালের। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষরা এমন এক পরিবেশ বেছে নিয়েছিল, যার একদিকে পাহাড় অন্যদিকে সমতল।

হোমো ইরেক্টাসের (ততদিনে তাদের ক্ষুদ্রতর প্রতিদ্বন্দ্বী হোমো হ্যাবিলিস বিলুপ্ত হয়ে গেছে) নিজেদের বাসস্থানের বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারাটা মানব প্রজাতির বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এক্ষেত্রে দুটি বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে ; এক, আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা, যার নিদর্শন পাওয়া যায় পূর্ব আফ্রিকায় চেসোয়াঞ্জা (Chesowanja) অঞ্চল থেকে, ১.৪ মিলিয়ন বছর পূর্বের ; দুই, আফ্রিকায় অর্জিত ক্ষমতা—পাথরের হাত-কুঠার বা Acheueian অস্ত্র তৈরি। আগুন মানুষের কাছে হাতিয়ার হয়ে উঠল যা দিয়ে তারা ঝোপঝাড়, জঙ্গল পরিষ্কার করতে পারে, মাংসকে আরও সুস্বাদু বানাতে পারে, হিংস্র বন্য জন্তুকে তাড়াতে পারে ; আর হাত-কুঠার মানুষকে খাদ্য সংগ্রাহক মাত্র থেকে শিকারিতে পরিণত করে। অবশেষে হোমো ইরেক্টাসরা সমতল সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল থেকে উন্মুক্ত সমতল ও মরুভূমি অঞ্চলের দিকে যেতে পারে। ইউরেশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মতো ভারতের অ্যাকিউলিয়ান (Acheulian) কেন্দ্রগুলি কার্যত সমস্ত ধরনের ভূভাগেই অবস্থিত, যদিও প্রস্তরের উৎসের কাছাকাছি থাকাটা তখনও একটা গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধকারী শর্ত (limiting factor) ছিল। সোহান উপত্যকা (পাকিস্তান) ও কাশ্মীরে অ্যাকিউলিয়ান অস্ত্রের আবির্ভাবের সর্বোচ্চ সীমা ধরা হয়েছে ৭,০০,০০০ বছর আগে ; কিন্তু সম্প্রতি কর্ণাটকের ইসলামপুরে প্রাপ্ত একটি প্রাণবন্ত অ্যাকিউলিয়ান শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা ১.২ মিলিয়ন বছরের পুরোনো। এই সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে ই. এস. আর. (electron spin resonance) দ্বারা, গবাদি পশুর দাঁতের কালনির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

৫,০০,০০০ বছর আগে হোমো ইরেক্টাসরা অন্য যে কোনো প্রজাতির গড় আয়ুষ্কাল অতিক্রম করে আসে এবং উপ-প্রজাতিতে বিভক্ত হয়ে দলবদ্ধভাবে পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এমনই বিবর্তিত প্রজাতি নিয়েন্ডারথাল (*Homo sapiens neanderthalis*), বিশেষভাবে শীতল জলবায়ুর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় (আরও শক্ত সমর্থ দেহসৌষ্ঠব তৈরি করে) এবং উত্তর ইউরেশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাদের নিদর্শন পাওয়া যায়, যেসব অঞ্চল প্লিস্টোসিন যুগের শেষ পর্যায়ে তুষারাবৃত হয়ে যায়। নর্মদা উপত্যকার হাতনোরায় (মধ্যপ্রদেশ) প্রাপ্ত ১,৩০,০০০ বছর আগেকার মাথার খুলি বিবর্তিত হোমো ইরেক্টাসের নিদর্শন, দৃশ্যতই তার মধ্যে নিয়েন্ডারথাল জাতীয় বৈশিষ্ট্য নেই। একইভাবে বিবর্তিত হোমো ইরেক্টাসের একটি উপ-প্রজাতি 'আর্কয়িক হোমো স্যাপিয়েন্স' (*Archaic homo sapiens*) থেকে আমাদের নিজস্ব প্রজাতি হোমো

Scanned with CamScanner

স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স বা দৈহিক গঠনানুযায়ী আধুনিক মানুষ প্রায় ১,৫০,০০০ বছর পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে আবির্ভূত হয়। সময়ের এই হিসাব প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে ; প্রজননবিদ্যা বিশেষজ্ঞরা এই সময়কালকে আরও পিছিয়ে দিতে চান—প্রায় ২,০০,০০০ বছর পূর্বে।

আমাদের প্রজাতির শারীরিক সুবিধা সম্ভবত বৃহৎ মস্তিষ্ক-প্রকোষ্ঠ (brain-case) বা করোটি নয় (নিয়ান্ডারথালেরও একইরকমভাবে তা বড়ো ছিল) ; বরং তা সরল নিপুণতার মধ্যেই সুবিধা নিহিত ছিল অর্থাৎ পেশির কৌশলী সঞ্চালনের জন্য পেশিগত শক্তি অর্জনের মধ্যে। এটাও সম্ভব যে, কথা বলার জন্য যে আরও বেশি ক্ষমতার প্রয়োজন, তা জিনগত বা আনুবংশিক (genetical) পরিবর্তনেরই অন্যতম একটি দিক। এই ক্ষমতার সাহায্যে আধুনিক মানুষ শুধু যে জটিলতর অস্ত্র তৈরি করার জন্য পেশিগত সক্ষমতা বাড়িয়েছিল তাই নয়, কথা বলার মাধ্যমে জ্ঞানের আদানপ্রদানের (অস্ত্র তৈরি করা সহ) এবং ঘনিষ্ঠ সামাজিক সহযোগিতার উপায়ও তৈরি করেছিল (যেমন—দলবদ্ধভাবে শিকার করা)। অন্যান্য মানব প্রজাতির মতো তারা শুধুমাত্র পাথরের অস্ত্র যেমন—ফলকায়িত চিলকা (flaked blade), হাত-কুঠার, 'লেভালয়েস-মৌস্টেরিয়ান' ('Levalois-Mousterian') ইত্যাদি অস্ত্রই তৈরি করেনি, তার সঙ্গে পশ্চাৎস্থিত চিলকা (backed blades), তারপর মাইক্রোলিথও তৈরি করেছিল। এই দুটি অস্ত্রই প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে তাদের অস্তিত্বের নিদর্শন রূপে গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৩০,০০০ বছর পূর্বে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী উপ-প্রজাতিদের উচ্ছেদ করে দিয়েছিল (ইউরোপে নিয়েন্ডারথালদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকেই বোঝা যায় সম্ভবত কী ঘটেছিল)। ভারতে, যেখানে আধুনিক মানুষ সম্ভবত ৭৫,০০০ বছর আগে এসেছিল, তারা শ্রীলঙ্কা ও ভারতে মাইক্রোলিথ তৈরি করা আরম্ভ করে ৩৫,০০০ বছর পূর্বে বা তারও আগে। এই অস্ত্র তার মারণ ক্ষমতা (ছুঁচালো বর্শা ও তির দ্বারা) এবং বসতি অঞ্চলে জনঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। কে. পাদাইয়া হিসেব করে দেখিয়েছেন, কর্ণাটকের দুটি অঞ্চলে (হুঙ্গসি ও বৈচবল উপত্যকা) জনঘনত্ব অ্যাকিউলিয়ান যুগে যেখানে ছিল ২ বর্গ কিলোমিটারে একজন, সেখানে মেসোলিথিক বা মধ্যপ্রস্তর (= মাইক্রোলিথিক) যুগে বৃদ্ধি পেয়ে হয় এক কিলোমিটারে পাঁচজন, অর্থাৎ দশগুণ বৃদ্ধি। মানুষ ততদিনে প্রকৃতির মধ্যে প্রাধান্যকারী একক প্রজাতি হয়ে ওঠে।

সারণি ১.১ ক্রমপঞ্জী

	বছর পূর্বে
ভূতাত্ত্বিক প্লায়োসিন যুগের সূচনা [টার্সিয়ারি মহাযুগের শেষ যুগ]	৫ মিলিয়ন
আফ্রিকায় (এবং এর বাইরে?) হোমো হ্যাবিলিসের পর্যায়	২.৬—১.৭ মিলিয়ন
আফ্রিকায় হোমো ইরেক্টাসের আবির্ভাব	২ মিলিয়নের বেশি

ক্রমশ

	বছর পূর্বে
ওভ্ডোয়ান অস্ত্র রিওয়াত (পাকিস্তান)	২ মিলিয়ন
ভূতাত্ত্বিক প্লিস্টোসিন যুগের সূচনা [কোয়াটারনারি অধিযুগের প্রথম যুগ]	১.৮ মিলিয়ন
অগ্নি নিয়ন্ত্রণের প্রথম প্রমাণ, চেসোয়াঞ্জা (কেনিয়া) এবং আফ্রিকায় প্রথম হাত-কুঠারের ব্যবহার	১.৪ মিলিয়ন
ভারতে হাত-কুঠার ব্যবহারকারীদের আবির্ভাব	১.২—০.৭ মিলিয়ন
প্লিস্টোসিনের শেষ পর্যায়ে তুষারযুগ (বা হিমযুগ) এবং আন্তর্হিমযুগ—সর্বোচ্চ মাত্রার হিসাবে	
তুষারযুগ-১	৩,৪০,০০০
আন্তর্হিমযুগ-১	৩,২০,০০০
তুষারযুগ-২	২,৬০,০০০
আন্তর্হিমযুগ-২	২,৪০,০০০
তুষারযুগ-৩	২,৩০,০০০
আন্তর্হিমযুগ-৩	২,১৫,০০০
তুষারযুগ-৪	১,৮৫,০০০
তুষারযুগ-৪ক	১,৫০,০০০
আন্তর্হিমযুগ-৪	১,২৫,০০০
তুষারযুগ-৫	৭০,০০০
তুষারযুগ-৫ক	২০,০০০
আন্তর্হিমযুগের সূচনা (হলোসিন)	১২,০০০—১০,০০০
দৈহিক গঠনের দিক থেকে আফ্রিকায় মানব প্রজাতির উৎপত্তি—*হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স*	১৫০,০০০
ভারতে আধুনিক মানবের আগমন	৭৫,০০০
শ্রীলঙ্কা এবং ভারতে ক্ষুদ্রাশ্মের উদ্ভবের প্রাচীনতম সময়কাল	৩৫,০০০

টীকা : সব সময়গুলিই আনুমানিক।

এখানে পরবর্তী প্লিস্টোসিন সময়ের তুষারযুগ এবং আন্তর্হিমযুগের যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা পাঠকের সুবিধার্থে, সেভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিন্যস্ত নয়। তুষারযুগ-৪ ও তুষারযুগ-৪ক এবং তুষারযুগ ৫ ও তুষারযুগ-৫ক-এর মাঝে বাস্তবে কোনো আন্তর্হিমযুগ ছিল না। এসময় কেবলমাত্র তাপমাত্রার সামান্য পার্থক্য দেখা দিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

উদ্ধৃতি ১.১

কাশ্মীরের প্লিস্টোসিন হ্রদ

পাঠ (Text) ক : কলহণের *রাজতরঙ্গিণী*, ১১৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দ, প্রথম অধ্যায়

২৫ : কল্পের সূচনালগ্ন থেকে, হিমালয়ের গহ্বর অঞ্চলটি জলপূর্ণ ছিল, যাকে প্রথম ছয়জন মনুর সময় সতী হ্রদ (সতী সরস) বলা হত।

২৬-২৭ : পরবর্তীকালে বর্তমান যুগে সপ্তম মনু বৈবস্বতের আবির্ভাব ঘটে, প্রজাপতি কাশ্যপের আহ্বানে দ্রুহিন, উপেন্দ্র ও রুদ্রের নেতৃত্বে ভগবানগণ এই হ্রদে বসবাসকারী জলোদ্ভব রাক্ষসকে নিধন করেন এবং সেই হ্রদের স্থানে কাশ্মীর অঞ্চলটি সৃষ্টি করেন।

—কলহন, *রাজতরঙ্গিণী*, মূল থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ এম. অরেল স্টাইনকৃত, প্রথম খণ্ড, লন্ডন, ১৯০০, পৃ. ৬। ইংরাজি পাঠের বাংলা ভাষান্তর।

টীকা : *কল্প* মিথবর্ণিত একটি সময়কাল।

পাঠ খ : ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের, মঁসিয়ে দ্য মার্ভেইকে লেখা পত্র (Letter to Monsieur de Merveilles), ১৬৬৫-এর গ্রীষ্মে কাশ্মীর থেকে রচিত

কচ্ছমীরের (Kachemire) প্রাচীন রাজাদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে বহুকাল পূর্বে সমগ্র অঞ্চলটি একটি হ্রদ ছিল এবং একজন পির অথবা একজন বয়স্ক সাধু জল নির্গমনের একটি পথ করে দেন এবং তিনিই অলৌকিকভাবে বারামৌলার (বারামুলার) পর্বত কেটেছিলেন।

এই তথ্যকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হয় জাহান গুয়ের (Jahan Guyre)-এর নির্দেশে (জাহাঙ্গীর, মুঘল সম্রাট ১৬০৫-১৬২৭)। এটি এখন আমি ফার্সি থেকে অনুবাদ করছি। আমি কখনোই অস্বীকার করব না যে এই অঞ্চলটি এক সময় জলবেষ্টিত ছিল, একই কথা প্রযোজ্য থেসালি ও অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও। আমি সহজে একথা মেনে নিতে পারি না যে নির্গমপথটি কোনো একজন মানুষের কাজ, কারণ পর্বত অত্যন্ত বৃহৎ ও শক্ত। বরং আমি মনে করি পর্বতটি কোনোভাবে ভূপৃষ্ঠের নীচে অবস্থিত নিমজ্জিত অগভীর খাদে ধসে গিয়েছিল, পরে কোনো ভূমিকম্পের ফলে তা আবার আত্মপ্রকাশ করে, কেননা ভূমিকম্প এ অঞ্চলে প্রায়শই ঘটত।

—ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের, *Travels in the Mughal Empire*, মূল ফরাসি থেকে ইংরাজি অনুবাদ, এ. কনস্টেবল কৃত, ভি. এ. স্মিথ কর্তৃক পরিমার্জিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, লন্ডন, ১৯১৬, পৃ. ৩৯৩-৯৫। গ্রন্থে উদ্ধৃত ইংরাজি পাঠের বাংলা ভাষান্তর।

টীকা ১.১

বাস্তুতন্ত্রবিদ্যা

বাস্তুতন্ত্রবিদ্যা একটি বিজ্ঞান যার উৎপত্তি সাম্প্রতিক কালে। এই শব্দটি ইংরাজিতে প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮৭৩ সালে। গ্রিক শব্দ 'ওইকোস' (Oikos) থেকে এর উৎপত্তি, যার অর্থ গৃহ। যেহেতু মানব প্রজাতির গৃহ প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে গঠিত, সেহেতু জার্মান বাস্তুবিজ্ঞানী ই. এইচ. হেকেল (১৮৭৯) বলেন যে বাস্তুতন্ত্রবিদ্যা এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে প্রাণী ও উদ্ভিদের পরস্পরের সম্পর্ক এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আলোচনা করা হয়। এই সংজ্ঞা থেকে বাস্তুতন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান—অজৈব ও জৈব উপাদান। অজৈব (বহির্বিশ্ব) উপাদানের মধ্যে পৃথিবীর আকৃতি, যেটি হচ্ছে ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয় ; তার সঙ্গে ভৌত শক্তিসমূহ যথা—ভূগাঠনিক চাপ, লাভা প্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, নদনদী, সৌর বিকিরণ, জলবায়ু ইত্যাদি। জৈব উপাদানের (সকল প্রকার Organism বা জীব) মধ্যে সকল উদ্ভিদ

ও প্রাণী প্রজাতি, এগুলি 'প্রাকৃতিক ইতিহাসের' বিষয়ের মধ্যেও পড়ে এবং এর বিষয়বস্তু থেকে মানুষ ও গৃহপালিত পশুকে বাদ দেওয়া হয় (দেখুন, *টীকা ৪.১*)। বাস্তুতন্ত্রবিদ্যার বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বন্যপ্রাণ এবং কর্ষিত উদ্ভিদ ও গৃহপালিত প্রাণীর ওপর প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের প্রভাব এবং বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যকার সম্পর্ক। কিন্তু বাস্তুতন্ত্রবিদ্যার প্রধান অধীত বিষয় হল প্রকৃতি কীভাবে মানুষকে এবং মানুষ তার কার্যকলাপের দ্বারা কীভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে, তার অজৈব ও জৈব উপাদানকে প্রভাবিত করে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ঘটনাবলির উপর ভিত্তি করে বাস্তুতন্ত্র চর্চাকে নানাভাগে ভাগ করা হয়। এরকম একটি ভাগকে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র (eco-system), যা একটি হ্রদ হতে পারে, একটি জোয়ার ভাটা যুক্ত খাঁড়ি বা একটি অরণ্য বা একটি নদী অববাহিকা বা একটি পার্বত্য অঞ্চল ইত্যাদি হতে পারে। যে স্থানকে কেন্দ্র করে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক বিষয়ক অধ্যয়ন করা হয় তাকে বলা হয় ভূচিত্র (landscape)। যে বাস্তুতন্ত্রের অধ্যয়ন করা হয় তার আকৃতি ও এলাকার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞান, যথা—ভূগোল, ভূতত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস এবং অন্যান্য বিশেষীকৃত বিজ্ঞান, যথা—বংশগতিবিদ্যা, জলানুসন্ধানবিদ্যা (Hydrology), জলবায়ুবিদ্যা (*টীকা* ২.১ দেখুন) এবং প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদির প্রয়োগ প্রয়োজন হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিরাচরিত বিভাজনের প্রেক্ষিতে বাস্তুতন্ত্রবিদ্যার অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রের সমন্বয়ের প্রয়োজন। এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে দেখা যায় বিভিন্ন বিষয় দ্বারা এটি প্রভাবিত হয়েছে ; যেমন প্রথম পর্বে জীববিদ্যার নানান শাখা, পরে নৃতত্ত্ব, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তা নৃতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এখন আবার জীববিদ্যা ও রসায়নের প্রভাব এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয়।

সর্ববৃহৎ 'বাস্তুতন্ত্র' যা বাস্তুতন্ত্রবিদ্যার মুখ্য বিষয় হল নিশ্চিতভাবে সমগ্র জীবমণ্ডল (biosphere) —পৃথিবীর সমগ্র জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডল যেখানে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। যদিও ভূগাঠনিক চাপ, পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপ (লাভা উদ্‌গিরণের মাধ্যমে) থেকে প্রাপ্ত শক্তি (খুবই সীমিত) বা বর্তমানে নিউক্লিয়ার বিভাজন থেকে কিছু শক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু এখনও এই প্রাচীন ধারণাটি প্রাসঙ্গিক যে সূর্যালোকই পৃথিবীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির প্রধান উৎস। এই শক্তি খাদ্যশৃঙ্খলের (food chain) মাধ্যমে জীবনকে অব্যাহত রাখে। খাদ্যশৃঙ্খল শুরু হয় যখন সূর্যালোক সালোকসংশ্লেষের দ্বারা রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়, বিশেষ করে সবুজ উদ্ভিদ যখন কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলকে কার্বোহাইড্রেটে (যেমন শর্করা) পরিণত করে। তৃণভোজীরা এই উদ্ভিদকে ভক্ষণ করে (যেমন গবাদি পশু ঘাস খায়), আবার এই তৃণভোজীদের মেরে ভক্ষণ করে মাংসাশী প্রাণী (যেমন মানুষ গবাদি পশুকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে)। এই খাদ্যশৃঙ্খল আরও ছোটো হতে পারে যদি মানুষ খাদ্যশস্য উৎপাদন করে এবং খাদ্যরূপে তা গ্রহণ করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই শৃঙ্খল অনেক বড়ো ও জটিল। শৈবাল (algae)-কে খায় ছোটো মাছ, এই মাছ ধরে আখের খেতে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়, এই আখ থেকে চিনি উৎপন্ন হয় যা মানুষের খাদ্য। তত্ত্বগতভাবে বহুস্তরীয় খাদ্যশৃঙ্খলের ফলে শক্তির অনেক অপচয় ঘটে। কেননা শক্তিপ্রবাহের সর্বশেষ স্তরের গ্রাহকের দিক থেকে বিচার করলে প্রতিটা ধাপে শক্তিব্যবহারকারী অনেকটা শক্তি ব্যবহার করে ফেলে, ফলে পরের ধাপ পর্যন্ত শক্তি ততটা পৌঁছোতে পারে না।

খাদ্যশৃঙ্খল এবং মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার প্রসঙ্গে সম্প্রতি একটি নৈতিক প্রশ্ন উঠে এসেছে : মানুষ কি শুধু নিজের সুবিধার কথা ভেবেই চালিত হবে এবং অন্যান্য প্রাণী, বিশেষত বন্যপ্রাণীদের ওপর মানুষের কার্যকলাপের কী পরিণাম হচ্ছে তা উপেক্ষা করবে? সব রকমের প্রাণীর ব্যাপারে মানুষের যে স্বাভাবিক কৌতূহল আছে, যার ফলেই চিড়িয়াখানা এবং পর্যটক আকর্ষণকারী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণাগার সৃষ্টি হয়েছে, তার থেকে এই প্রশ্নটিকে পৃথক ভাবে দেখতে হবে। এখন যা আদর্শ বলে মনে করা হয়, তা হচ্ছে **জীববৈচিত্র্য** সংরক্ষণ, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে সর্বাধিক সংখ্যক

Scanned with CamScanner

প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির অস্তিত্ব। এখন এই ধারণাও পূর্বের চেয়ে দৃঢ় হয়েছে যে সমস্ত প্রাণী প্রজাতিরই (এমনকি মানুষের দৃষ্টিতে যারা একেবারেই আকর্ষক নয়) বিলুপ্তির হাত থেকে সংরক্ষণ প্রয়োজন ; অবশ্যই এই বিলুপ্তির কারণ হল মানুষের কার্যকলাপ—খাদ্য বা প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য শিকার, তাদের বাসস্থান ধ্বংস করা বা কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহারে ফলে তাদের খাদ্যের উৎস নির্মূল করা। 'ঐতিহাসিক বাস্তুতন্ত্রবিদ্যা' মতবাদের প্রবক্তাদের মতে, মানুষের ক্রিয়াকলাপ অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর হয়নি, বরং অতীতে বিভিন্নভাবে তা জীববৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে, যেমন আগুন দিয়ে অরণ্য পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে নবজীবন চক্রের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ প্রাণকে আরও শক্তির জোগান দিয়েছে। অবশ্যই এই বক্তব্য অতিরঞ্জিত, তা সত্ত্বেও তাঁদের বক্তব্য বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

যদিও অন্য প্রজাতির প্রতি সমবেদনা থাকাটা স্বাভাবিক এবং ভবিষ্যতে এই বিষয়টি মানবীয় নীতিবিদ্যার এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠবে, কিন্তু 'গ্রহণীয় বাস্তুতন্ত্রবিদ্যার' (Popular Ecology) বিষয়কে সতর্কভাবে বিবেচনা করতে হবে। এই মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতিকে নিজের মতো থাকতে দেওয়া উচিত, মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের আগে পরিবেশ ছিল সকল জীবিত প্রজাতির বসবাসের আদর্শ স্থান। কারণ অজান্তেই বিভিন্ন প্রজাতি পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিত, যার ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় ছিল। আবার, এও বলা হয়ে থাকে যে, অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় প্রকৃতি ভারসাম্যের বদলে বিশৃঙ্খলার দিকে এগিয়ে যায়। মাংসাশী প্রাণী তৃণভোজীদের এবং তৃণভোজীরা উদ্ভিদকে ভক্ষণ করে, শুধু তাই নয়, উদ্ভিদরাও একই উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। অরণ্যের দীর্ঘ গাছগুলো সূর্যালোক পায়, আর তাদের নীচে যে ছোটো গাছ জন্মায় তারা সূর্যের আলো না পেয়ে মরে যায়। আবার বিভিন্ন প্রজাতি জটিল সম্পর্কের লড়াইয়েও জড়িয়ে পড়ে। যেমন, উদ্ভিদ নিজ বংশধরকে রক্ষার জন্য বীজের ওপর ফলে যে আস্তরণ তৈরি করে তা পাখি ও তৃণভোজীদের পরিপাকতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে।

আর একটি ভুল থেকে বাস্তুতন্ত্রবিদ্যার সতর্ক থাকা উচিত, তা হল, বিশেষভাবে অতীতের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় মানব সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনের পিছনে পরিবেশের পরিবর্তনের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই প্রবণতাকে বলা হয় **পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণবাদ** (Environmental Determinism), সাংস্কৃতিক বাস্তুতন্ত্রবিদ্যার প্রবক্তাদের মধ্যে এটি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। একথা সত্যি যে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন মানবিক সাড়া (response) বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এসব বিষয় নিয়ে ক্রমাগত বিতর্ক হয়ে চলেছে, যেমন কয়েকটি অঞ্চলে শুষ্ক পর্যায়ের সূচনা আমাদের পূর্বপুরুষদের বন্য ঘাস চাষ করতে বাধ্য করেছিল কিনা, যার থেকে কর্ষণযোগ্য শস্য জন্ম হতে পারে। আবার সিন্ধু অববাহিকায় একটি তীব্র শুষ্ক পর্যায় সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ কিনা (পরিচ্ছেদ ২.৪ দেখুন)। এখানে প্রথমত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে একই ধরনের পরিবেশগত পরিবর্তন, মানুষের সচেতনতা, জ্ঞান, সামাজিক সংগঠনের ধরন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের ওপর নির্ভর করে মানুষের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এই প্রত্যেকটি কারণই গুরুত্বপূর্ণ, আর একটি ঘটনা যা ইতিহাসে পরিবেশের প্রত্যক্ষ ভূমিকাকে অনেকটা প্রভাবিত করে তা হল ব্যাপন বা বিস্তার বা **প্রসারণ** (Diffusion)। একটি ছোটো অঞ্চলে পরিবেশগত চাপ খুব সম্ভবত সেখানে বন্য শস্য চাষকে প্রভাবিত করে, কিন্তু যখন খাদ্যের উৎস রূপে কৃষি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মানুষের অভিপ্রয়াণ বা সরল অনুকরণের ফলে কৃষিও অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তারলাভ করে। আদি বাসস্থান অঞ্চলে যে পরিবেশগত চাপ ছিল নতুন অঞ্চলে সেই চাপ প্রভাবিত নাও করতে পারে বা সেখানে হয়তো বন্য ঘাসও ছিল না যা থেকে শস্য বিবর্তিত হতে পারে। দ্রুত বিস্তারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে উন্নত সংস্কৃতির মানদণ্ড হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন জনিত চাপের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। গত তিরিশ বছর ধরে বাস্তুতন্ত্রবিদ্যার

প্রধান বিষয় হল কলকারাখানার বর্জ্য পদার্থ থকে বায়ু ও **জলদূষণ** এবং তজ্জনিত **জলবায়ুর পরিবর্তন**। আঞ্চলিক স্তরে, মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটছে, সেখানে সমগ্র সম্প্রদায় এবং ধীরে ধীরে সমগ জীবমণ্ডল দূষণ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। ভূতাত্ত্বিক সময়কাল অনুযায়ী আমরা হলোসিন যুগে বাস করছি, সূর্যের চারিধারের কক্ষপথে পরিবর্তনের ফলে আমরা এক উষ্ণ পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছি। কিন্তু বিগত দুশো বছরের শিল্পজনিত ক্রিয়াকলাপ এই উষ্ণায়নকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সংক্ষেপে এর কারণ হল গাড়ি ও কলকারখানা থেকে নির্গত ক্রমবর্ধমান কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা বেশি বেশি পরিমাণে সূর্যতাপকে আবদ্ধ করা। জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লার ছাই, অন্যান্য জ্বলে যাওয়া বস্তু, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম) বায়ুমণ্ডলে চলে আসার জন্য এই নির্গমন ঘটছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী অরণ্যহননের জন্য সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক CO_2 শোষণের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের আগে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ ছিল ২৮০ পি. পি. এম. (parts per million), আর এখন (২০০৯ সালে) তা পৌঁছেছে ৩৮০ পি. পি. এম.। ফলে ১৯৫০ সাল থেকে বিশ্বতাপমাত্রা সুস্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু ১৯৭০ সালের পর থেকে তা দ্রুত হারে বাড়ছে। বর্তমানে কার্বন ডাই-অক্সাইডের যে সঞ্চয় রয়েছে, যদি তা অপরিবর্তিতও থেকে যায়, তাহলেও তা নানা পরিবর্তন ঘটাবে, যথা—বৃষ্টিপাতের সময়কালের পরিবর্তন, মেরুপ্রদেশের ও হিমালয়ের বরফস্তূপের গলন এবং ভবিষ্যতে সমুদ্রতলের বৃদ্ধি। এপর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অতিরিক্ত সঞ্চয়ের জন্য মূলত পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলিই দায়ী। কিন্তু পশ্চিমি দেশগুলি এই উষ্ণায়নের জন্য বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলি যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তার দায়িত্ব নেবে কিনা সন্দেহ। CO_2-এর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা যৎসামান্য, কিন্তু উষ্ণায়নের ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে সমুদ্র জলতল বৃদ্ধির জন্য সে বিরাট ভূভাগ ভবিষ্যতে হারাতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে বাস্তুতন্ত্রবিদ্যা চর্চা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং বর্তমান বিশ্বের মানব সমাজ, বিশেষত আধিপত্যকারী শক্তিগুলি কীভাবে প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে এবং নিজেদের স্বার্থে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায় তাও বিচার করতে হবে। এ বিষয়ে আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোকপাত করব, সেখানে ঔপনিবেশিকতার যুগে বাস্তুতন্ত্রবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

টীকা ১.২

গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত টীকা

ভারতীয় পরিবেশ সম্পর্কে জানার জন্য যে ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট দরকার তা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে ও. কে. এইচ. স্পেট এবং এ. টি. এ. লিয়ারমন্থ-এর *India and Pakistan : A General and Regional Geography*, লন্ডন, ১৯৬৭ বইটিতে। বইটি পড়ার সময় মনে রাখতে হবে যে তখন পর্যন্ত বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়নি। এই গ্রন্থে বি. এইচ. ফার্মার রচিত শ্রীলঙ্কার ওপর একটি পৃথক পরিচ্ছেদ রয়েছে। এস. এম. মাথুরের *Physical Geography of India*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, ১৯৮৬ (অনেকবার পুনর্মুদ্রিত) ভৌগোলিক তথ্যের একটি প্রয়োজনীয় সমীক্ষা এবং এতে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়েরই বর্ণনা আছে, যা অন্যান্য অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্তরে বাস্তুতান্ত্রিক ইতিহাসের জন্য একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হল অ্যান্থনি এন. পেন্না-র (Anthony N. Penna) *The Human Footprint—A Global Environmental History*, মালডেন, ইউ. এস. ২০১০ (পেপারব্যাক)। আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল, জোয়াচিম রাদকাউ-এর (Joachim Radkau) *Nature and Power : A Global History of the Environment*, কেমব্রিজ, ২০০৮ (পেপারব্যাক)। মানুষের প্রাক-ইতিহাস এবং তখনকার পরিবেশগত অবস্থার কথা জানতে গেলে ব্রায়ান এম. ফ্যাগান

Scanned with CamScanner

(Brain M. Fagan)-এর *People of the Earth : An Introduction to World Pre-history*, একাদশতম সংস্করণ, ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ২০০৪ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে বিশ্বের প্রাক-হলোসিন বাস্তুতন্ত্রের অবস্থা জানার ক্ষেত্রে খুবই সাহায্য করবে *Antiquity* (UK), *Archaeology* (US), *National Geographic* (US) ইত্যাদি পত্রিকার সাম্প্রতিক রচনা এবং বিশেষ করে ভারতের অবস্থা জানার জন্য *Man and Environment* (পুনে) পত্রিকাটি খুবই সহায়ক। প্লিস্টোসিন যুগের জলবায়ুর পরিবর্তনের বিষয় জানার জন্য খুবই সহায়ক গ্রন্থ হল য়োশিনোরি য়াসুদা ও বসন্ত শিন্ডে (Yoshinori Yasuda and Vasant Shinde) সম্পাদিত *Monsoon and Civilization*, নয়া দিল্লি, ২০০৪। বইটিতে ভারত ও চিনের সাম্প্রতিক তথ্য পাওয়া যাবে। এই সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য রয়েছে অনেকের রচনায়, যথা মাইকেল ডি. পেট্রাগ্লিয়া ও ব্রিজেট অলচিন (Michael D. Petraglia and Bridget Allchin) সম্পাদিত *The Evolution and History of Human Populations in South Asia*, Dordrecht, ২০০৭। বি. পি. সাহু রচিত *From Hunters to Breeders*, দিল্লি, ১৯৮৭ গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে জীবাশ্ম ঘটিত প্রমাণাদির বর্ণনা রয়েছে।

সারণি ১.১-এ (ক্রমপঞ্জী) তুষারযুগ এবং আন্তর্হিমযুগের জন্য এবং চিত্র ১.১ যে লেখচিত্রের ওপর ভিত্তি করে এখানে দেওয়া হয়েছে, তা *National Geographic* থেকে নেওয়া, তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ। অ্যাকিউলিয়ান ও মধ্যপ্রস্তর যুগে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলের জনঘনত্ব নির্ধারণ সংক্রান্ত কে. পাদাইয়ার (K. Padayya) হিসাব তাঁর অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র 'Prehistoric Technology in India'-এর থেকে নেওয়া।

যাঁরা বাস্তুতন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহী (টীকা ১.১-এর মূল বিষয়) তাঁরা উইলিয়াম বিলী (William Belée) সম্পাদিত *Advances in Historical Ecology* গ্রন্থে আনুষাঙ্গিক তথ্য পাবেন। যদিও এতে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, ভারতীয় বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে একগুচ্ছ রচনার সংগ্রহ হল এ. সেট্টার এবং রবি করিসেট্টার সম্পাদিত *Archeology and Interactive Disciplines*, নয়াদিল্লি, ২০০২।

Scanned with CamScanner